BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03110041
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 11| November 2025| e-ISSN: 2584-1890

বিজন ভট্টাচার্যের ‘গোত্রান্তর’ : দেশভাগ, বাস্তুহারা জীবন ও শ্রেণি-রূপান্তরের আখ্যান

Sandip Bar

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi, Email: sandipbar99@gmai.com

Abstract: *১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া লাখ লাখ বাস্তুহারা ছিন্নমূল মানুষের মানবেতর জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং মধ্যবিত্ত আভিজাত্যের অবক্ষয় বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৫-১৯৭৮) কালজয়ী নাটক ‘গোত্রান্তর’-এর মূল উপজীব্য। কেন্দ্রীয় চরিত্র শিক্ষক হরেন্দ্র মাস্টার এবং তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন কীভাবে এক সময়ের সম্পন্ন পরিবার কলকাতায় এসে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয় এবং শেষ পর্যন্ত জীবনধারণের তাগিদে শিক্ষকতা ছেড়ে রাস্তায় ফেরিওয়ালার পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়। গবেষণাধর্মী নিবন্ধটিতে ‘গোত্রান্তর’ শব্দটির বহুমাত্রিক অর্থ অন্বেষণ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক-কন্যা গৌরীর সাথে বস্তিবাসী শ্রমিক কানাইয়ের প্রেম ও বিবাহকে ‘গোত্রান্তর’ মনে হলেও, এর গভীরতর তাৎপর্য হলো মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্ত মেকি ভদ্রতা ও শ্রেণি-আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে শ্রমজীবী সর্বহারা সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া। কলোনি ও কলকাতার বস্তিজীবনের অবর্ণনীয় প্রতিকূলতা এবং মালিকপক্ষের উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে হরেন্দ্র মাস্টারের রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ এই রূপান্তরকে পূর্ণতা দেয়। ‘গোত্রান্তর’ কেবল একটি পারিবারিক বিপর্যয় বা পেশাগত পরিবর্তন নয়, বরং এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের এক নতুন ভাষা এবং আসন্ন সমাজ-বিপ্লবের এক বলিষ্ঠ পূর্বাভাস।*

Keywords: *দেশভাগ, শরণার্থী, ছিন্নমূল, বিজন ভট্টাচার্য, গোত্রান্তর, হরেন্দ্র মাস্টার, বস্তি, যৌথ প্রতিরোধ।*

Introduction: ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে ভারতবাসী অবশেষে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল। এর মাধ্যমে যেমন পূরণ হয়েছিল বহু বছরের লালিত স্বপ্ন, ঠিক তেমনই সার্থকতা পেয়েছিল অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ ও বলিদান। কিন্তু এই বিপুল আনন্দের সমান্তরালে বেজে উঠেছিল এক গভীর বেদনার সুর- দেশভাগ। নিজেদের চেনা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তু মানুষের বুকফাটা হাহাকার স্বাধীন ভারতের জয়ের উল্লাসকে অনেকটাই মলিন করে দিয়েছিল। দেশভাগ এবং তার ফলে তৈরি হওয়া বাস্তুহারা সমস্যা বিপুলসংখ্যক মানুষকে স্রেফ মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজার তাগিদে পথে নামতে বাধ্য করেছিল। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৪৯ সালের শেষভাগ নাগাদ ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ হাজার। এরপর ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় নতুন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে, ১৯৫১ সালের মধ্যে সেই শরণার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫ লক্ষেরও বেশি। পরবর্তী পাঁচ বছরে এই গ্রাফ আরও দ্রুত গতিতে ওপরে উঠতে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই দেশভাগ এবং লাখ লাখ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়া ছিল তৎকালীন সময়ের এক বিশাল সামাজিক বিপর্যয়। যে মানুষগুলো বহু প্রজন্ম ধরে নিজেদের জমি, ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি ভোগ করে আসছিল, আকস্মিকভাবে তারা সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কোনো রকম সম্বল ছাড়াই তাদের আশ্রয় নিতে হয় এক সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা পরিবেশে, যা তাদের ঠেলে দেয় এক চরম অস্তিত্বের সংকটে। নিজের ঘর, জমি, প্রতিবেশী এবং প্রিয়জনদের হারিয়ে এই সর্বহারা মানুষগুলো রাতারাতি পথবাসী হয়ে পড়েছিল। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের এই চরম দুর্দশা, বেঁচে থাকার লড়াই এবং তীব্র মানসিক যন্ত্রণার বাস্তব চিত্রকে পটভূমি করেই গড়ে উঠেছে সমাজসচেতন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৫-১৯৭৮) কালজয়ী নাটক ‘গোত্রান্তর’।

Discussion: এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য গবেষক ও নাট্যসমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ও নাট্যভাবনা স্পষ্ট করে বলেছিলেন— "১৯৫৬/৫৭ সালে গোত্রান্তর লিখি ও প্রযোজনা করি। দেশভাগের অভিজ্ঞতা আমি তুলে ধরি এক বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের এ-পারের অভিজ্ঞতায়। মধ্যবিত্ত সমাজ তাকে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত বস্তির শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে সে মুক্তি পায়। কমিটমেন্টের রাজনীতি, একত্র সংগ্রামের রাজনীতিই ছিল আমার রাজনীতি।"[১]

তবে 'গোত্রান্তর' রচনার সময়কাল নিয়ে নাট্যকার অন্যত্র কিছুটা ভিন্ন দাবিও করেছেন। তাঁর মতে, নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার অনেক আগেই রচিত হয়েছিল। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে এক লেখায় তিনি উল্লেখ করেন— "গোত্রান্তর লিখি ১৩৫৪ সালে। দেশ বিভাগ ও তজ্জনিত অভিসম্পাত তখন গোটা দেশের মাথায় উপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে। নাটকাকারে প্রকাশিত হবার পর মঞ্চস্থ করবার ইচ্ছা থাকলেও নবনাট্যের রাজরানীর জলসায় অনূঢ়া কন্যা গৌরীর হাত ধরে বহু বৎসর প্রতীক্ষা করি। তারপর 'গোত্রান্তর' মঞ্চস্থ করি মাত্র সেদিন অতি আয়াসে।"[২]

ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র অনুযায়ী, ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৬৬ বঙ্গাব্দে) শারদীয়া 'বসুমতী' পত্রিকায় 'গোত্রান্তর' প্রথম প্রকাশিত হয় এবং একই বছর এটি গ্রন্থাকারেও আত্মপ্রকাশ করে। এর বেশ কিছুকাল পর, ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট, এক রবিবারে 'নিউ এম্পায়ার' প্রেক্ষাগৃহে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। 'ক্যালকাটা থিয়েটার' -এর এই প্রযোজনায় নির্দেশনার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় চরিত্রে স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় করেছিলেন। গঠনগতভাবে তিন অঙ্কের এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটির প্রথম অঙ্কে একটি, দ্বিতীয় অঙ্কে একটি এবং তৃতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য রয়েছে। সমগ্র নাটকের মূল উপজীব্য হলো দেশভাগজনিত সংকট এবং ভিটেমাটি হারানো ছিন্নমূল মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। বিজন ভট্টাচার্যের এই সৃষ্টিশীল রূপান্তর সম্পর্কে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক মন্তব্য করেছেন— "এইখান থেকে তিনি প্রচণ্ডভাবে সংকেতময় নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এর পটভূমিকা বিশাল। একটা মাস্টার মশায়ের চোখ থেকে একটি সম্পূর্ণ বস্তির এক বিরাট গাথা।"[৩]

দেশভাগের ফলে সৃষ্ট বিপুল মানুষের বাস্তুত্যাগ আমাদের চেনা সমাজে যে অভাবিত ও অভূতপূর্ব দুর্যোগ ডেকে এনেছিল, তা আমাদের চিরাচরিত শান্ত-অনাবিল জীবনধারাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয়। পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থীর অসহায় দুর্গতি, খোলা রাস্তা, রেল স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম কিংবা গাদাগাদি করে থাকা বদ্ধ শরণার্থী শিবিরের মানবেতর জীবনযাত্রা তৎকালীন সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ক্ষুধার জ্বালা আর আশ্রয়ের খোঁজে মরিয়া এই জীবনে পারিবারিক শালীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। চারপাশে বিস্তার লাভ করেছিল বিকৃত লালসা আর অশুভ অর্থলিপ্সার এক মরণফাঁদ। চরম অভাবের তাড়নায় মানুষের সহজাত মনুষ্যত্ব যেন আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। ফলে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির হাত ধরে কেবল যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বদলেছিল তা নয়- অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্কের অন্দরমহলেও ঘটে গিয়েছিল এক আমূল ও ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং সর্বোপরি এই দেশভাগের সম্মিলিত আঘাতে বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড একবারে ভেঙে পড়েছিল। হরেন মাস্টারের মেয়ে গৌরীর কথায়— "জোতজমি, খামার বাড়ি কিছুরই তো অভাব আছিল না। ...হ্যাঁ, সেইখানে তো আমরা রাজা।"[৪]

দেশভাগের নির্মম অভিঘাতে নিজের ভিটেমাটি হারিয়ে ছিন্নমূল শিক্ষক হরেন্দ্র মাস্টার স্ত্রী শঙ্করী এবং কন্যা গৌরীকে নিয়ে 'শান্তি কলোনি'তে এসে আশ্রয় নেন। চিরচেনা পরিবেশ থেকে ছিটকে পড়ে গৌরী তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, এই দেশভাগ আর দেশত্যাগের সঙ্গেই তাদের জীবনের চেনা পরিচিতি ও মর্যাদার এক আমূল 'গোত্রান্তর' ঘটে গেছে— "স্রোতের শেওলার মত এইখানে এক মাস, ওইখানে দুই মাস -যারে কয় এক্কেরে গরিব দুঃখীর জীবন।"[৫]

পেশায় শিক্ষক হওয়ার কারণে হরেন্দ্র মাস্টার কলোনির মধ্যেই একটি পাঠশালা চালু করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু নির্মম বাস্তবতার মুখে তাঁর সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; পাঠশালায় পড়ার মতো পর্যাপ্ত ছাত্র জোটে না। জীবিকার সন্ধানে কলোনির বহু মানুষ কলোনি ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়। অন্যদিকে, যাদের কিছুটা আর্থিক সামর্থ্য ছিল, তারা অন্য কোনো উন্নত এলাকায় জমি কিনে পাকাপাকিভাবে ঘর বাঁধে। কিন্তু হরেন্দ্র মাস্টারের না ছিল তেমন কোনো আর্থিক সংবল, আর না জানা ছিল মাস্টারি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জনের পথ। এমন এক চরম সংকটের মুহূর্তে হরেন্দ্রর ভাই কেশব কলকাতায় গিয়ে একটি কাজের ব্যবস্থা করে এবং পরবর্তীকালে হরেন্দ্রর পরিবারকে কলকাতায় নিয়ে আসে। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হরেন্দ্রর

কাছে কেশবই তখন হয়ে ওঠে আশার একমাত্র আলো। বুকভরা স্বপ্ন আর নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কলকাতার এক ভাড়াবাড়িতে শুরু হয় হরেন্দ্র মাস্টারের পরিবারের বেঁচে থাকার এক নতুন সংগ্রাম। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে হঠাৎ করেই কেশবের সেই চাকরিটি চলে যায়, যা তাদের আবার এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। হরেন্দ্রর সংসারে আবার শোকের ছায়া নেমে আসে— "হরেন্দ্র : অত কিছু না, এমন কিছু হয় নাই শোন, আইজকাল চাকরি বাকরির এমনেই যা অবস্থা, সবই টেম্পোরারি সার্ভিস তো, আইজ আছে কাল নাই চাকুরি, তা কেশব যে চাকরি করত না সেই চাকরিটা তার গেছে। সেই নোটশ আইছে বরখাস্তের।

হরেন্দ্র : (গৌরীকে উদ্দেশ করে) তুইও দেখি কানতাছস্।

শঙ্করী : ও কি কিছু জানে? ও কাঁন্দে হুতাশে।

গৌরী : মা তুমি কাইন্দো না মা... (শঙ্করী কাঁদেন)

হরেন্দ্র : আমার চক্ষে জলও নাই, কান্দাও নাই। (শঙ্করীকে) এই তুমি কাইন্দাই মাইয়ারে কান্দাইলে।... গৌরী মা, কান্দে না। ...হরেন্দ্রর চোখে জল। ...(গৌরীকে) গৌরী কান্দিস না। ...চাকরি গেছে কাকু আবার জোগাড় কইর্‌্যা নিতে পারবো চাকরি। কাকু তো আর আমার মতন অকম্মা না। ...দেখলি না, কাকু কেমন চাকরি জুটাইয়া লইয়া আইল আমাগো ক্যাম্প থিকা কলকাতা।"[৬]

বকেয়া বাড়িভাড়া দিতে না পারার অপরাধে বাড়িওয়ালা চরম অমানবিকতার পরিচয় দিয়ে কেশব ও হরেন্দ্র মাস্টারকে সপরিবারে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বাড়িওয়ালার এই অভব্য ও অপমানজনক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ক্ষুব্ধ কেশব হাত তুললে, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ফলে, একমাত্র আশার আলোটুকু নিভে যাওয়ায় সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে হরেন্দ্র মাস্টার তাঁর পরিবারকে নিয়ে কলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়ান। পেটের তাগিদে এবং বেঁচে থাকার নির্মম টানে শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতার মতো মহান পেশা ছেড়ে হরেন্দ্র মাস্টার রাস্তায় রাস্তায় খেলনা, পুতুল আর চিরুনি ফেরি করা শুরু করেন। এভাবেই তাঁর জীবনের আসল 'গোত্রান্তর' ঘটতে থাকে। ভাগ্যের চরম পরিহাসে যে হাত একদিন শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণ করত, আজ সেই হাতকেই সামান্য অন্নের সংস্থানের জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে সস্তা খেলনা বিক্রি করতে হয়। কলকাতার ভাড়াবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর তাঁদের মাথা গোঁজার নতুন ঠিকানা খুঁজে নিতে হয় এক কারখানা সংলগ্ন ঘিঞ্জি শ্রমিক বস্তিতে। তবে সমাজের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তরা তাঁদের অবজ্ঞা করলেও, বস্তির সেই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলো কিন্তু এই অসহায় শিক্ষক এবং তাঁর পরিবারকে অত্যন্ত পরম মমতায় ও সাদরে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে নেয়। বৃদ্ধা বস্তিবাসী শৈলী বলে—

"শৈলী : কী বাবা, বস্তিতে থাকতে পারবেন? দেখুন!

উকিলবাবু : আবার দেখুন কি, পেলে তো বেঁচে যান ভদ্দর লোক।

শৈলী : দাঁড়ান মশায়, যিনি থাকবেন তাঁকে বলতে দিন আপনারা তো এতক্ষণ বললেন! (হরেন্দ্রকে) কী বাবা, থাকতে পারবেন! অসুবিধা কিন্তু বিস্তর হবে- বস্তির ব্যাপার!

হরেন্দ্র : মুখ দিয়া কবুল করাইতে চাও বুড়ি! তা ভদ্দরলোকের দেমাক তো আর নাই রে মা। অহন মাথা গুঁজবার মতো একটা জাগা পাইলেই বাঁইচা যাই।

শৈলী : (গৌরীকে লক্ষ্য করে) এটা কে, মেয়ে!

হরেন্দ্র : হ মাইয়া, (শঙ্করীকে দেখিয়ে) আর ইনি আমার স্ত্রী।

শৈলী : (আপশোশ করে) ছি ছি ছি ছি ভদ্দর লোকের সর্ব্বনাশ ভদ্দর আদমী কি এইভাবে করে? ছি ছি ছি ছি।... চুপ করো মা, চুপ করো। কিছু ভয় নেই, কোনও ভয় নেই। (শঙ্করীকে) দুঃখীর কোনো জাত নেই মা। আমরা সব দুঃখী। আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে তো? তবে আমরা তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেব না, এটা ঠিক!..."[৭]

বস্তিবাসীদের এমন মানবিক আচরণ হরেন্দ্র মাস্টারকে মুগ্ধ করে। তারা তথাকথিত অশিক্ষিত এবং শ্রমজীবী মানুষ হয়েও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর তুলনায় তাদের মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রে উন্নত তা উপলব্ধি করেন।

নতুন আশ্রয়ে এসেও হরেন্দ্র মাস্টারের পরিবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে না। মালিকপক্ষ বস্তি উচ্ছেদ করতে মরিয়া, তাই সেখানে হামলা ও হাঙ্গামা লেগেই থাকে। এই সংকটের মুহূর্তে শৈলীর কণ্ঠে শোনা যায় শ্রমজীবী মানুষের সংহতির কথা। সে বলে— "পারেনি শুধু এককাট্টা আছি বলে। ...একটা গাছের গোড়া ধরে টান মেরে তুমি সহজেই উপড়ে ফেলতে পার, কিন্তু আমাদের এখানে কম সে কম পাঁচশো ঘর মানুষের বাস গোড়া যতই কমজোর হোক্ পাঁচশো গাছের মাথা একসঙ্গে পেঁচিয়ে তো আর তুমি একটানে উপড়ে ফেলতে পার না!"[৮]

প্রতিকূলতার পাহাড় সামনে রেখেও মাস্টারের পরিবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে শামিল হয়ে মাস্টারের স্ত্রী শঙ্করী লোকচক্ষুর আড়ালে এক বাবুর বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নেন। অন্যদিকে, হরেন্দ্র মাস্টারের চোখেও নতুনভাবে পাঠশালা গড়ার স্বপ্ন এবং ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি উপলব্ধি করেন যে কেবল ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বসে থাকলে চলবে না, বরং নিজেদের ইতিহাস নিজেদেরই গড়তে হবে। মাস্টারের ভাষায়— "চোখ বুইজ্যা এক্কেরে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হইয়া না থাইক্যা, আইসো সকলে মিল্যা ইতিহাস আমরা একটা বানাই। আরে ইতিহাসের যেমুন আমি, আমারও তো তেমুন ইতিহাস!"[৯]

ধীরে ধীরে বস্তির এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে মাস্টার অন্তর থেকে ভালোবেসে ফেলেন। অভাব-অনটনের মাঝেও বস্তিবাসীদের সঙ্গে তাঁর এক গভীর আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়। তিনি জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শেখেন এবং খুঁজে পান মানবতার এক অনন্য পাঠ। তবে মাস্টার-পত্নী শঙ্করী তাঁর আভিজাত্য আর সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে এই বস্তিজীবনকে কোনোভাবেই আত্মস্থ করে নিতে পারেন না।

যাবতীয় সংকট, অভাব-অনটন আর জীবনযুদ্ধের চরম ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেই এক অদ্ভুত সমীকরণে হরেন্দ্র মাস্টারের কন্যা গৌরী ভালোবেসে ফেলে বস্তিবাসী শৈলীর ছেলে, কারখানার লড়াকু শ্রমিক কানাইকে। কানাইও তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে গৌরীকে আপন করে নেয়। কিন্তু একজন শিক্ষক-কন্যার সঙ্গে একজন সামান্য কল-কারখানার মজুরের এই ভালোবাসার সম্পর্ককে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না গৌরীর মা শঙ্করী। তবে হরেন্দ্র মাস্টার কিন্তু সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাদের এই সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেন। কারণ, জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি বুঝেছিলেন মানুষের তৈরি শ্রেণি, গোত্র, পেশা কিংবা সামাজিক মর্যাদার চেয়েও পৃথিবীতে অনেক বেশি সত্য ও বড়ো হয়ে ওঠে পারস্পরিক আত্মিক টান এবং নিখাদ মানবিক সম্পর্ক। মাস্টার তার স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন—

> "হরেন্দ্র : কানাইয়ের লগে গৌরীর একটা বুঝ হইছে।
>
> শঙ্করী : বুঝ হইছে?
>
> হরেন্দ্র : হ, হ গৌরীরও একটা বুঝ হইছে কানাইয়ের লগে।
>
> শঙ্করী : কী বুঝ?
>
> হরেন্দ্র : বুঝ, অখন কেমনে বুঝাই তোমারে কানাই গৌরীকে ভালোবাসে।
>
> শঙ্করী : গৌরীরে?
>
> হরেন্দ্র : গৌরীও কানাইরে ভালোবাসে।
>
> শঙ্করী : তুমি কী কইতে চাও?
>
> হরেন্দ্র : আমি কিছু কই না। তারা যা কয় আমি শুধা তাই তোমারে কইলাম। ওরা দুজনেই একটু আগে আমার কাছে কবুল কইরা গেল।
>
> শঙ্করী : এ অসম্ভব।
>
> হরেন্দ্র : অসম্ভবই তো সম্ভব হইছে দেখি।
>
> শঙ্করী : তুমি এইটা ঠিক কও?

হরেন্দ্র : বেঠিক কই কেমনে? আমার বাধা এক সংস্কার। কিন্তু ন্যায়ত ধর্মত যেটা সত্য, তারে আমি অস্বীকার করতে পারুম না। ঠিক আছে, ঠিকই আছে। ভগবান সাক্ষী - ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আমি না কইতে পারুম না। ঠিক আছে। এ বিয়া হইব। এই বিয়াই হইব।”[১০]

চারিদিকে বেজে ওঠে সানাইয়ের সুর। মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে কানাই ও গৌরীর বিয়ের আসর। কিন্তু এই আনন্দের আবহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ঠিক তখনই বস্তি উচ্ছেদ করতে মালিকপক্ষের গুণ্ডা ও লেঠেল বাহিনী অতর্কিতে হামলা চালায়। তারা নির্মমভাবে ভাঙতে শুরু করে গরিব মানুষের মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকু। এই তাণ্ডবের মধ্যেও উৎসবের আনন্দ আর প্রতিরোধের অদম্য ইচ্ছায় কোনোমতে রাতটুকু কাটে। ভোরের আলো ফুটতেই দেখা যায়, পুরো বস্তি ভেঙেচুরে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার আর নিস্পৃহ থাকা নয়, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সশরীরে প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন খোদ হরেন্দ্র মাস্টার। উগ্রপন্থীদের লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হন তিনি, ফেটে যায় তাঁর মাথা। বাসি বিয়ের সেই বিষণ্ণ সকালটি কনের কপালের সিঁদুর আর শিক্ষকের গায়ের তাজা রক্তে একাকার হয়ে লাল হয়ে ওঠে। এই চরম বিপর্যয়ে আর্তনাদ করে ওঠে শৈলী—

“শৈলী : মাস্টার! মাস্টার! এ কী হল মাস্টার। এ আমার কী হল মাস্টার! সব যে ভেঙে গেল মাস্টার। ...আমার সাধ সোহাগের ছেলে, বউ, ঘর গেরস্তি, আমার বস্তি।

হরেন্দ্র : টিপনি দেখছ বুড়ি রক্তচন্দনের। এই দেখ, এই দেখ, আর ওই দেখ।

শৈলী : মাস্টার!

হরেন্দ্র : ...বিয়া গেছে কাইল, আইজ গেল বাসি বিয়া কোন রাজার বেটার বিয়াতে এত ঘটা হইছে কইতে পার বুড়ি? - এত বাজনা, এত বাদ্য।

শৈলী : মাস্টার!!

হরেন্দ্র : বুড়ি, জোকার দাও, শঙ্খ বাজাও, মাইয়া উঠাও ঘরে। হেই বিশ্বকর্মার পুতের দল, চুপচাপ খারাইয়া আছস, হাত লাগাইতে পারস না তরা? হাত চালাও, কাম কর, উঠাও বস্তি। হাতে হাতে সংসার গড়ে ওঠে তখন। আবার। হেইয়া হো, হেইয়া হো, হেইয়া হো, হেইয়া হো... সমবেত কণ্ঠে জয়গান ওঠে জীবনের।”[১১]

এই চরম ধ্বংস ও ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েও হরেন্দ্র মাস্টার পরাজয় মেনে নেননি। বরং রক্তাক্ত মাথা নিয়েই তিনি নতুন করে বস্তি গড়ার জোরালো ডাক দেন। যে মানুষের আজীবন কাজ ছিল বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মাঝে উপযুক্ত ছাত্র গড়ে তোলা, আজ জীবনের কঠিনতম পাঠশালায় এসে তিনি হয়ে উঠেছেন বস্তি সংগঠনের এক অনন্য ‘বিশ্বকর্মা’। এভাবেই নাটকটির শেষে হরেন্দ্র মাস্টারের চরিত্রের চূড়ান্ত ‘গোত্রান্তর’ বা রূপান্তর ঘটে। তিনি খুঁজে পান অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এক নতুন ভাষা, যৌথ সংগঠনের অদম্য প্রেরণা এবং সর্বোপরি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার প্রকৃত ও সঠিক অর্থ। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার তার ইঙ্গিত দিয়েছেন— “নীতিবাদের প্রশ্ন নয়- জীবনের ক্ষেত্রেই ‘গোত্রান্তর’ আজ যুগসত্য। আর জীবনের ক্ষেত্রে যে সত্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার মতোই সমুজ্জ্বল- নাটকে তার অপলাপ করা কোনও নাট্যকারের জীবনধর্ম হতে পারে না।”[১২]

‘গোত্রান্তর’ বিষণ্ণ করে না হরেন্দ্র মাস্টারকে। বরং গোত্রান্তরিত হয়েই তিনি খুঁজে পান প্রতিরোধের নতুন ভাষা। লড়াই আর সংগঠনের নতুন প্রেরণা, জীবনের মানে। নাটকের ‘গোত্রান্তর’ সম্পর্কে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন— “নাটকের মধ্যে এই গোত্রান্তর কিভাবে ঘটল তাহা আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষক-কন্যা গৌরী বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইকে ভালোবাসিল এবং অবশেষে উহাদের বিবাহ হইল ইহাই গোত্রান্তর। কিন্তু গোত্রান্তরের আর একটি ব্যাপকতর তাৎপর্য রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত সমাজ যে আজ সমস্ত শিক্ষাদিক্ষা, ভদ্রতা ও শ্রেণী-আভিজাত্যের গোত্রবন্ধন ছিন্ন করিয়া কায়িক পরিশ্রমজীবী শ্রমিক সমাজের গোত্রভুক্ত হইয়া পড়িতেছে, ইহাই প্রকৃত গোত্রান্তর।”[১৩]

Conclusion: ‘গোত্রান্তর’ শব্দটি আসলে বহুমাত্রিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক-কন্যা গৌরীর সঙ্গে বস্তিবাসী লড়াকু শ্রমিক যুবক কানাইয়ের প্রেম এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণয়ই নাটকের মূল ‘গোত্রান্তর’। কিন্তু বিজন ভট্টাচার্য এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আরও এক ব্যাপকতর ও গভীরতর সামাজিক তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তৎকালীন বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত সমাজের তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষা, মেকি ভদ্রতা ও রক্ষণশীল শ্রেণি-

আভিজাত্যের সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে শেষ পর্যন্ত যে তারা শ্রমজীবী ও সর্বহারা সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল- এটাই হলো নাটকের প্রকৃত ও বাস্তব 'গোত্রান্তর'। নাটকটিতে আমরা আরও একটি চূড়ান্ত গোত্রান্তর লক্ষ্য করি তার ক্লাইম্যাক্সে এসে। সেই মহাসংকটের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শিক্ষক হরেন্দ্র মাস্টারের ভেতরের রূপান্তরটি সম্পূর্ণতা পায়। তিনি আর পাঁচজন মধ্যবিত্তের মতো কেবল সহানুভূতিকারী বা বস্তির কোনো সাময়িক 'অতিথি' হিসেবে নিজেকে গুটিয়ে রাখেননি; বরং শোষিত ও বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণির একজন সুযোগ্য নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই আবার নতুন করে আশার আলো জ্বালান এবং যৌথ প্রতিরোধের সঙ্ঘবদ্ধ আহ্বান জানান। সামগ্রিকভাবে, 'গোত্রান্তর' নাটকের মূল বক্তব্য এর নামকরণের মধ্য দিয়েই অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষা ও আভিজাত্যের অন্ধ অহংকার বিসর্জন দিয়ে সমাজের কুলীন ও অকুলীন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এক সমগোত্রীয় মানবিক মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা। নাটকের মূল ভাবধারা ও মর্মবাণীকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার যে সমস্ত ঘটনার অবতারণা করেছেন, তার পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে এক উচ্চশিক্ষিত ভদ্র পরিবারের সামাজিক ব্যর্থতা ও বিলোপের করুণ আখ্যান। একই সঙ্গে এটি তৎকালীন সমাজ-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরম শ্রেণি-বৈষম্য এবং আসন্ন এক অনিবার্য সমাজ-বিপ্লবের বলিষ্ঠ পূর্বাভাস।

Reference:

(১) ভট্টাচার্য, বিজন। (১৩৮৪)। অভিজ্ঞতার থিয়েটার, গন্ধর্ব সাহিত্য পত্রিকা, আশ্বিন সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ২৭

(২) ভট্টাচার্য, বিজন। (১৪১৫)। রচনাসংগ্রহ - ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ৩৪৩

(৩) ঘটক, ঋত্বিক। (১৯৭৫)। বিজন ভট্টাচার্য : জীবনের সূত্রধর, নাট্যদর্পণ, ১ম বর্ষ, (মে') ১ম সংখ্যা

(৪) পূর্বোক্ত, রচনাসংগ্রহ - ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৮৮

(৫) পূর্বোক্ত

(৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৩

(৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৪

(৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৬

(৯) পূর্বোক্ত

(১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৮

(১১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৯

(১২) পূর্বোক্ত, রচনাসংগ্রহ - ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৪

(১৩) ঘোষ, অজিতকুমার। (২০১৮)। বাংলা নাটকের ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ৩৭৮

Citation: **Bar. S.,** (2025) "বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' : দেশভাগ, বাস্তুহারা জীবন ও শ্রেণি-রূপান্তরের আখ্যান", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-11, November-2025.